দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি : এই মুহূর্তের সমীকরণ

ভূ-রাজনৈতিক বিচারে দক্ষিণ এশিয়া একটি নতুন প্রেক্ষাপট বা অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। বিখ্যাত ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক Halford Mackinder-এর 'Heartland' তত্ত্ব কিংবা Alfred Mahan-এর 'Sea Power' তত্ত্ব ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বকে যুগে যুগে তুলে ধরেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সামনে ভূ-রাজনীতি এখন নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া প্রায় দুই দশক আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তির পরীক্ষা করে, তখন থেকেই বলা চলে দক্ষিণ এশিয়ার এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা শুরু হয়। তার আগে অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯১ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি, সেটিও দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলকে যেভাবে এটি প্রভাবিত করেছিল, দক্ষিণ এশিয়ার বেলায় সেটি ঘটেনি। কারণ, আমরা লক্ষ করেছিলাম যে স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পরও দক্ষিণ এশিয়ায় যেসব আঞ্চলিক এবং দ্বিপক্ষীয় বিরোধ ছিল, সেগুলোর তেমন কোনো সমাধান হয়নি। শুধু তা-ই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ভেতরে আঞ্চলিক সহযোগিতার যে বিষয়টি তা খুব একটা গতি লাভ করেনি। এর অন্যতম উদাহরণ সার্ক, যেটি ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল, সে প্রচেষ্টাটি স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির পরও তেমন একটা সাফল্যের মুখ দেখেনি। যে কারণে দক্ষিণ এশিয়াকে বলা হয় এমন একটি অঞ্চল, যেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাত্রা সবচেয়ে কম।

যা হোক, আমরা দুই দশক ধরে লক্ষ করছি দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক মানচিত্র, ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র, সার্বিকভাবে পুরো অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের ভেতরে যে ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ভারত। আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হলো ভারত এবং সেই অর্থনৈতিক শক্তি এই অঞ্চলে অবস্থিত। পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিও গত দুই দশকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এবং এই মুহূর্তে বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান- এই দেশ দুটির অর্থনীতিও শক্তিশালী। ফলে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত যেমন শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি আমরা জানি যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষের বেশি। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি বিশাল বাজার রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটছে। ফলে বিশ্বের যে কোনো বহুজাতিক কোম্পানি, যে কোনো শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষিণ এশিয়া একটি আকর্ষণীয় বাজার, একটি আকর্ষণীয় অর্থনীতি। ফলে এই পরিবর্তনের ধারায় আমরা লক্ষ করলাম এই অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাও আরো ব্যাপক মাত্রায় ঘটেছে। যদিও যে কোনো অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের কতগুলো স্থায়ী উপাদান থাকে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিকভাবেই তা লক্ষ করি। এই স্থায়ী উপাদানগুলো যদি দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় যে আঞ্চলিক ব্যবস্থা আছে, তাতে ভারত এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী শুধু নয়, দেশটি বিশ্বে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। যে রাষ্ট্রগুলোকে কেন্দ্র করে একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা আছে, তা একটি ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এই অঞ্চলের সব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সঙ্গেই ভারতের সীমান্ত আছে বা ভারতেরও প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত। এখানে একদিকে যেমন ভুটান বা নেপালের মতো Landlocked দেশগুলো যেমন ভারতের প্রতিবেশী, একই সঙ্গে বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কাও ভারতের প্রতিবেশী। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের রয়েছে বিশাল সমুদ্রসীমা। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের তিন দিকে সীমান্ত রয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিশাল স্থলসীমা রয়েছে। ফলে ভারতকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে একধরনের ভূ-রাজনৈতিক আন্তনির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে আমরা যদি এই বাস্তবতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, দেখা যাবে, প্রতিটি দেশের নিজস্ব ভৌগোলিক যে অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আরো অন্যান্য কৌশলগত যে উপাদান আছে, সেই উপাদানগুলো দ্বারাও প্রভাবিত। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির স্থায়ী উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথমেই আমরা বলতে পারি, দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে একটি বিশাল ভৌগোলিক অবস্থান, একটি ভৌগোলিক সীমানা। এই সীমানার একদিকে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া; আরেক দিকে মধ্য এশিয়া বা Central Asia বা আরো বড় অর্থে মধ্যপ্রাচ্য। দক্ষিণ এশিয়ার

এক দিকে ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর, অন্যদিকে আরব সাগর। দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তটি এমনভাবে অবস্থিত, যার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক যোগাযোগ যেমন সম্ভব, তেমনিভাবে স্থলপথে যোগাযোগও। গুরুত্বপূর্ণ হলো কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পূর্ব এশিয়া। পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হলো চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। ফলে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া এবং তারপরে মধ্যপ্রাচ্য। মধ্যপ্রাচ্যের পরেই আমরা দেখছি আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক আছে দক্ষিণ এশিয়ার এবং ইউরোপের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। তার মানে দক্ষিণ এশিয়া ভূ-রাজনৈতিকভাবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় দক্ষিণ এশিয়ার একটি আন্ত-আঞ্চলিক মাত্রা রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতায় রয়েছে ভূ-রাজনীতির আরেকটি মাত্রা, যা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। এখানেও ভারতের উপস্থিতি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত রয়েছে। আফগানিস্তান ব্যতীত সব কটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে ভারতের স্থল ও জলসীমান্ত। দক্ষিণ এশিয়া পেরিয়ে ভারতের সীমান্ত রয়েছে চীনের ও মিয়ানমারের সঙ্গে। ভারতের জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, স্থল ও জলসীমান্ত, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে ভারতের ব্যাপক উপস্থিতি ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও নেপালের রয়েছে ব্যাপক ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব। এমনকি আয়তন কিংবা জনসংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেও ভুটান ও মালদ্বীপের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব, যা অতিসম্প্রতি আমরা লক্ষ করেছি। এই দেশগুলো একদিকে যেমন ভারতের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে যুক্ত, অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে সীমান্ত। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারত মহাসাগরের অবস্থান বিবেচনায় শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য।

দক্ষিণ এশিয়ার অভ্যন্তরে সব রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ও বাস্তবতার বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ না থাকলেও বাংলাদেশের বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে অবতারণা করা যেতে পারে। একদা India Locked কিংবা ‘tyranny of geography’-এর কথা বলে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা বলা হলেও প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনার করা যেতে পারে।

সারাক্ষণ

প্রথমত, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব নতুন মাত্রা পাচ্ছে। ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করে বিশ্ব শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থান বাংলাদেশের গুরুত্বকে বহুগুণে বৃদ্ধি করছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সত্ত্বেও মিয়ানমার অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের ভূ-রাজনৈতিক দিকটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তা ছাড়া ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে রয়েছে বিশাল সমুদ্র সীমানা, যা নৌ শক্তিভিত্তিক সমর কৌশলের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান একাধিক এশীয় অঞ্চলের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। যেমন: দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অবস্থিত। অন্যদিকে পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মধ্যে দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক উপাদান আছে। একটি হচ্ছে ভারতের মূল খণ্ড ও উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সংযোগস্থল হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান। Transit ও Connectivity রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এই ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা, যা ভারতের বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অন্য উপাদানটি হচ্ছে ‘শিলিগুড়ি করিডর’, যা চিকেন নেক হিসেবে অধিক জনপ্রিয়। বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যকার ১২ মাইলের একটি করিডর হচ্ছে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর স্থল যোগাযোগের একমাত্র পথ। চীন-ভারত সম্ভাব্য বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে এই চিকেন নেকটি বন্ধ হয়ে গেলে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে ভুটান ও বাংলাদেশের অবস্থান ভূ-রাজনৈতিক বিচারে সীমাহীন গুরুত্ব বহন করে। চতুর্থত, বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর, যা দেশটির ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বকে শুধু বৃদ্ধিই করেনি, বরং স্থল ও নৌ শক্তির সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামরিক কৌশল বিনির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে

বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র অঞ্চল, যাকে বিশ্লেষকরা একটি নতুন বাংলাদেশ আখ্যা দিয়ে দেশটির ভূ-কৌশলগত অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। পঞ্চমত, বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা সম্পদ দেশটির ভূ-রাজনৈতিক শক্তিকে আরো জোরদার করেছে। জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র বাংলাদেশ; যা যে কোনো বিচারে একটি ঈর্ষণীয় উপাদান। ষষ্ঠত, সর্বশেষে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ সামরিক ইতিহাস। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রাম বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। অত্যন্ত সুসজ্জিত ও পরিকল্পিত পাকিস্তানের ন্যক্কারজনক সামরিক আক্রমণকে প্রতিহত করে গেরিলাযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া একটি বড় ধরনের সামরিক সাফল্য। তা ছাড়া প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনে এই অঞ্চলের মানুষ নির্ভীক ও অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়েছে। এই ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক পটভূমি ভূ-রাজনৈতিক শক্তি বিশ্লেষণে বিশেষ সহায়ক।

ফলে বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে একটি নতুন সময় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ভূ-রাজনীতির স্থায়ী উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অস্থায়ী কিংবা সমকালীন ‘Situational’ বিষয়সমূহ। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে ভারত-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি। ভারত-চীন সম্পর্ক অম্ল-মধুর হলেও প্রায় দুই দশক ধরে এই সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সম্পর্ক বিশেষভাবে অবনতি হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের নাটকীয় অবনতি, চীন-পাকিস্তান সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি- এই দুই দেশের সম্পর্ককে আরো তিক্ত করেছে। এই বৈরিতার মধ্যে কফিনের শেষ আঘাতের মতোই এসেছে গত জুন মাসে ভারত-চীন গালওয়ান উপত্যকা সীমান্ত সংঘর্ষে। এই সীমান্ত সংঘর্ষ উসকে দিয়েছে চীন এবং ভারতকে আরো শত্রুতায়, আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই তিক্ততা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর স্নায়ুযুদ্ধকালীন পরিলক্ষিত হয়েছিল। ফলে দক্ষিণ এশিয়া দৃশ্যত একটি স্নায়ুযুদ্ধের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ভারত ও চীনের সম্পর্কের মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তন না ঘটলে এই ঠাণ্ডা লড়াই একটি বাস্তবতা হতে যাচ্ছে। হয়তো কারো কারো কাছে এটি বর্তমান।

দ্বিতীয়ত, ভারত-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো কিছু বৈশ্বিক প্রবণতা। চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডোলে চীন-মার্কিন বৈরিতা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় এই বৈরিতা দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক গণ্ডি পেরিয়ে পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক (Systemic) ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সদস্যরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও যুক্তরাজ্য চীনকে কৌশলগত ও মতাদর্শিকভাবে মোকাবিলা করছে। এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার, হংকং পরিস্থিতি, দক্ষিণ চীন বিরোধ ও চীনের বৈশ্বিক প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করছে। নিঃসন্দেহে ভারতের চীন বিরোধিতার বিষয়টি আরো গতি পাচ্ছে।

তৃতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন; বিশেষ করে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং ব্রেক্সিট-পরবর্তী যুক্তরাজ্য বর্তমান বিশ্বে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখার জন্য তৎপর। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, আসিয়ান, ইরান, তুরস্ক, উপসাগরীয় দেশসমূহ ও ব্রাজিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বৃহৎ ও সামরিক শক্তি হিসেবে পরিচিত এই রাষ্ট্রগুলো দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ শক্তির পক্ষে কাজ করছে, আবার কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারসাম্য তৈরি করছে। বর্তমান বিশ্বে নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশ এই প্রবণতাসমূহ দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হচ্ছে।

উল্লিখিত বৈশ্বিক কিংবা বাহ্যিক প্রবণতাসমূহ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। বিশেষ করে চীন-ভারত দ্বৈরত, ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা, রোহিঙ্গা সংকট, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোকে নজিরবিহীনভাবে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে মালদ্বীপ পর্যন্ত প্রতিটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নতুন করে হিসাব কসছে, যা অর্ধদশক আগেও অকল্পনীয় ছিল। যদিও চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) ও ইন্দোপ্যাসিফিক স্টেটেজি (IPS)-এর মাধ্যমে একধরনের চাপ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কিছু সময় আগে থেকেই অনুধাবন করছিল। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, যুক্তরাজ্য ও ইইউ দেশগুলোর আগ্রহ এই অঞ্চলের প্রতি বরাবরই ছিল। কিন্তু চীন ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্কের কিছুটা

স্থিতিশীলতা স্বাভাবিক পরিস্থিতি (Status quo) বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। এমনকি ২০১৭ সালের চীন-ভারত ডোকলাম (Doklam) সংকট থেকেও বের হয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছিল। তবে গালওয়ান উপত্যকা ঘটনা-পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ ভূ-রাজনৈতিকভাবে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি। ইতিমধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে, ভারত ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে চীনের BRI কর্মসূচি, দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং কূটনৈতিক বোঝাপড়া একটি বড় ভূমিকা রাখছে। এই দেশগুলোতে সরকার কিংবা রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে স্পষ্টত চীন ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে দ্বিধাবিভক্তি আছে। নেপাল একটি অন্যতম উদাহরণ। চীন ও ভারতের মধ্যকার এই বাফার রাষ্ট্রটি (Buffer State) বর্তমানে ভারতের সঙ্গে সরাসরি সীমান্ত ও কূটনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে, যা অত্যন্ত বিরল। বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতির আলোকে বলা যেতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মেরুকরণের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। এই মেরুকরণ অনেকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের দ্বিমেরুকেন্দ্রিক শক্তিকাঠামোর মতো। দীর্ঘদিনের ভারতকেন্দ্রিক আঞ্চলিক কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এটি একটি নাটকীয় পরিবর্তনের লক্ষণ। অর্থাৎ এক ধরনের Paradigm Shift যা কিছুদিন আগেও অননুমেয় ছিল। ভারতের প্রতিবেশী প্রথম কিংবা 'অ্যাক্টইস্ট' নীতি খুব বেশি কার্যকর হয়েছে বলে ধরা যাবে না। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হলেও মেরুকরণের বিষয়টি ধীরে ধীরে সামনে চলে আসছে। এ পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যভিত্তিক কূটনীতি বজায় রাখছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে পেশাদারত্ব ও জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। মেরুকরণের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ চাপকে সফলভাবে মোকাবিলা করছে। বাংলাদেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কূটনৈতিক দক্ষতা এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিশেষভাবে সহায়তা করছে। বাংলাদেশ ব্যতীত এই অঞ্চলের অন্য দেশসমূহের ওপর এ মেরুকরণের প্রভাব পরিষ্কারভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি জন্ম থেকেই, অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকেই মেরুকরণের মধ্যে ছিল। বর্তমান মেরুকরণ দেশটির জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে, যদিও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে দেশটি বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। পাকিস্তান এই মেরুকরণকে দৃশ্যত স্বাগত জানাবে এবং সম্পূর্ণ ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করবে। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ভুটান এই নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকটা বিচলিত হলেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি অতীতের মতো প্রশ্নাতীত নয়। কোনো কোনো বিষয়ে এ দেশগুলো ইতিমধ্যে চীনের মুখাপেক্ষী হচ্ছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্তি একটি প্রধান বিষয়। অন্যদিকে নেপাল দৃশ্যত চীনের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করছে, যা দেশটির সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে এই অঞ্চলে কোনো কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামো গড়ে না ওঠার কারণে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মেরুকরণ সহজেই পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে ভারত কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ ও অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের মাধ্যমে এই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে আরো শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পাকিস্তান একটি ব্যতিক্রম। একই সঙ্গে চীন হয়তো আরো বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বিশেষ করে চীন-মার্কিন বৈরিতা ও ইউরোপের সঙ্গে নতুন দূরত্বের ফলে চীন দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি আরো মনোযোগী হবে। এ পরিস্থিতিতে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এই নতুন মেরুকরণ দ্বারা অবধারিতভাবে প্রভাবিত হবে। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর হয়ে উঠবে আরো অশান্ত। নতুন এই ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মতো বৃহৎ শক্তির সর্বগ্রাসী দ্বন্দ্বের যেন শিকার না হয়। তথাকথিত পরাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বকে নিরন্তর প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ভাবনায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল। তৈরি করেছিল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক আধিপত্যবাদী কাঠামো, যা থেকে আজও রাষ্ট্রসমূহ বের হতে পারেনি। তবে বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তি নির্ভরতা, বিশ্বায়নের প্রভাব, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর প্রজন্ম ও বাজার অর্থনীতির স্পর্শকাতরতা দক্ষিণ এশিয়ায় মেরুকরণের প্রভাবকে সীমিত করতে সহায়তা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা, কূটনৈতিক দক্ষতা জ্ঞানভিত্তিক নীতি নির্ধারণ ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিরোধ পরিহারের মাধ্যমে শক্তিশালী ও ভারসাম্য পররাষ্ট্রনীতি দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।